

অবাক জলপান

সুকুমার রায়



[ছাতা মাথায় এক পখিকের প্রবেশ, পিঠে লাঠির আগায় লোটা-বাঁধা পুঁটলি, উষ্কখুষ্ক চুল, শ্রান্ত চেহারা]

পখিক। নাঃ একটু জল না পেলে আর চলছে না। সেই সকাল থেকে হেঁটে আসছি, এখনও প্রায় এক ঘণ্টার পথ বাকি। তেষ্টায় মগজের ঘিলু শুকিয়ে উঠল। কিন্তু জল চাই কার কাছে? গেরস্তের বাড়ি দুপুর রোদে দরজা এঁটে সব ঘুম দিচ্ছে, ডাকলে সাড়া দেয় না। বেশি চেষ্টাতে গেলে হয়তো লোকজন নিয়ে তেড়ে আসবে। পথেও ত লোকজন দেখছি। ঐ একজন আসছে! ওকেই জিজ্ঞেস করা যাক।

[ঝুড়ি মাথায় এক ব্যক্তির প্রবেশ]

পখিক। মশাই, একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন?

ঝুড়িওয়ালা। জলপাই? জলপাই এখন কোথায় পাবেন? এ ত জলপাইয়ের সময় নয়। কাঁচা আম চান দিতে পারি—

পখিক। না না, আমি তা বলিনি—

ঝুড়িওয়ালা। না কাঁচা আম আপনি বলেননি, কিন্তু জলপাই চাচ্ছিলেন কিনা, তা ত আর এখন পাওয়া যাবে না, তাই বলছিলুম—

পথিক। না হে, আমি জলপাই চাচ্ছিলে—

ঝুড়িওয়ালা। চাচ্ছেন না তো, 'কোথায় পাব' কচ্ছেন কেন? খামকা এরকম করবার মানে কী?

পথিক। আপনি ভুল বুঝেছেন—আমি জল চাচ্ছিলাম—

ঝুড়িওয়ালা জল চাচ্ছেন তো 'জল' বললেই হয়— 'জলপাই' বলবার দরকার কী?

জল আর জলপাই কি এক হল? আলু আর আলুবোখারা কি সমান? মাছও যা আর মাছরাঙাও তাই? বরকে কি আপনি বরকন্দাজ বলেন? চাল কিনতে গেলে কি চালতার খোঁজ করেন?

পথিক। ঘাট হয়েছে মশাই। আপনার সঙ্গে কথা বলাই আমার অন্যয় হয়েছে।

ঝুড়িওয়ালা। অন্যয় তো হয়েছেই। দেখছেন ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছি—তবে জলই-বা চাচ্ছেন কেন? ঝুড়িতে করে কি জল নেয়? লোকের সঙ্গে কথা কইতে গেলে একটু বিবেচনা করে বলতে হয়।

[প্রস্থান]

পথিক। দেখলে! কী কথায় কী বানিয়ে ফেললে! যাক, ঐ বুড়ো আসছে, ওকে একবার বলে দেখি।

[লাঠিহাতে, চটি পায়ে, চাদর গায়ে এক বৃন্দ্র প্রবেশ]

বৃন্দ্র। কে ও? গোপ্লা নাকি?

পথিক। আঙে না, আমি পুৰগাঁয়ের লোক—একটু জলের খোঁজ কচ্ছিলুম—

বৃন্দ্র। বল কিহে? পুৰগাঁও ছেড়ে এখানে এয়েছ জলের খোঁজ করতে? -হাঃ, হাঃ, হাঃ। তা, যাই বল বাপু, অমন জল কিন্তু কোথাও পাবে না। খাসা জল, তোফা জল, চমৎকা-৷-র জল।

পথিক। আঙে হা, সেই সকাল থেকে হাঁটতে হাঁটতে বেজায় তেষ্টা পেয়ে গেছে।

বৃন্দ্র। তা ত পাবেই। ভালো জল যদি হয়, তা দেখলে তেষ্টা পায়, নাম করলে তেষ্টা পায়, ভাবতে গেলে তেষ্টা পায়। তেমন জল ত খাওনি কখনো! -বলি ঘুমুড়ির জল খেয়েছ কোনোদিন?

পথিক। আঙে না, তা খাইনি—

বৃন্দ্র। খাওনি? অ্যাঃ! ঘুমুড়ি হচেছ আমার মামাবাড়ি—আদত জলের জায়গা। সেখানকার যে জল, সে কী বলব তোমায়? কত জল খেলাম-কলের জল, নদীর জল, ঝরনার জল, পুকুরের জল—কিন্তু মামাবাড়ির কুয়ার যে জল, অমনটি আর কোথাও খেলাম না। ঠিক যেন চিনির পানি, ঠিক যেন ক্যাণ্ডা-দেওয়া সরবৎ!

পথিক। তা মশাই আপনার জল আপনি মাথায় করে রাখুন—আপাতত এখন তেষ্টার সময়, যা হয় একটু জল আমার গলায় পড়লেই চলবে—

বৃন্দ। তাহলে বাপু তোমার গাঁয়ে বসে জল খেলেই ত পারতে? পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে জল খেতে আসবার দরকার কি ছিল? যা হয় একটা হলেই হল ও আবার কী রকম কথা? আর অমন তাচ্ছিল্য করে বলবারই-বা দরকার কি? আমাদের জল পছন্দ না হয়, খেও না-বাস্। গায়ে পড়ে নিন্দে করবার দরকার কি? আমি ওরকম ভালোবাসিনে। হ্যাঁঃ-[রাগে গজগজ করিতে করিতে বৃন্দে প্রস্থান]

[পাশের এক বাড়ির জানলা খুলিয়া আর এক বৃন্দে হাসিমুখ বাহিরকরণ]

বৃন্দ। কী হে? এত তর্কাতর্কি কিসের?

পথিক। আজে না, তর্ক নয়। আমি জল চাইছিলুম তা উনি সে কথা কানেই নেন না—কেবলই সাত পাঁচ গপ্প করতে লেগেছেন। তাই বলতে গেলুম তো রেগে মেগে অস্থির!

বৃন্দ। আরে দূর দূর! তুমিও যেমন! জিজ্ঞেস করবার আর লোক পাওনি? ও হতভাগা জানেই বা কী, আর বলবেই বা কী? ওর যে দাদা আছে, খালিপূরে চাকরি করে, সেটা তো একটা আস্ত গাধা! ও মুখ্যাটা কী বললে তোমায়?

পথিক! কী জানি মশাই—জলের কথা বলতেই কুয়ার জল, নদীর জল, পুকুরের জল, কলের জল, মামাবাড়ির জল, বলে পাঁচ রকম ফর্দ শুনিয়ে দিলে—

বৃন্দ। হুঃ—ভাবলে খুব বাহাদুরি করেছি। তোমায় বোকা মতন দেখে খুব চাল চেলে নিয়েছে। ভারি ত ফর্দ করছেন! আমি লিখে দিতে পারি, ও যদি পাঁচটা জল বলে থাকে তা আমি একুশটা পঁচিশটা বলে দেব—

পথিক। আজে হ্যাঁ। কিন্তু আমি বলছিলুম কি একটু খাবার জল—

বৃন্দ। কী বলছ? বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা শূনে যাও। বিষ্টির জল, ডাবের জল, নাকের জল, চোখের জল, জিবেবের জল, হুঁকোর জল, ফটিক জল, রোদে ঘেমে জ-ল, আহ্লাদে গলে জ-ল, গায়ের রক্ত জ-ল, বুঝিয়ে দিল যেন জ-ল—কটা হয়? গোনোনি বুঝি?

পথিক। না মশাই, গুনিনি—আমার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই—

বৃন্দ। তোমার কাজ না থাকলেও আমাদের কাজ থাকতে পারে ত? যাও, যাও, মেলা বকিও না।— একেবারে অপদার্থের এক শেষ! [সশব্দে জানলা বন্ধ]

পথিক। নাঃ, আর জলটল চেয়ে কাজ নেই—এগিয়ে যাই, দেখি কোথাও পুকুরটুকুর পাই কিনা।

[লম্বা লম্বা চুল, চোখে সোনার চশমা, হাতে খাতা পেন্সিল, পায়ে কটকী জুতা, একটি ছোকরার প্রবেশ]

লোকটা নেহাত এসে পড়েছে যখন, একটু জিজ্ঞাসাই করে দেখি। মশাই আমি অনেক দূর থেকে আসছি, এখানে একটু জল মিলবে না কোথাও?

ছোকরা। কী বলছেন? ‘জল’ মিলবে না? খুব মিলবে। একশোবার মিলবে! দাঁড়ান একুশটা মিলিয়ে দিচ্ছি।— জল চল তল বল কল ফল— মিলের অভাব কি? কাজল সজল-উজ্জল-জ্বলজ্বল-চঞ্চল চল চল, আখিজল হল হল, নদীজল কল কল, হাসি শূনি খল খল, অ্যাকনল বাঁকানল, আগল ছাগল পাগল— কত চান।

পথিক। এ দেখি আরেক পাগল! মশাই, আমি সে রকম মিলবার কথা বলিনি।

ছোকরা। তবে কোন রকম মিল চাচ্ছেন বলুন? কী রকম, কোন ছন্দ, সব বলে দিন—যেমনটি চাইবেন তেমনটি করে মিলিয়ে দেব।

পথিক। ভালো বিপদেই পড়া গেল দেখছি—(জোরে) মশাই! আর কিছু চাইনে—(আরো জোরে) শুধু—একটু জল—খেতে চাই। ছোকরা—ও বুঝেছি। শুধু একটু জল খেতে চাই। এইত? আচ্ছা বেশ। এ আর মিলবে না কেন? ভারি তেষ্টাপ্রাণ আই—চাই কিন্তু কোথা গেলে পাই—বল্ শীঘ্র বল্ নারে ভাই। কেমন? ঠিক মিলছে ত?

পথিক। আঙে হ্যাঁ, খুব মিলছে—খাসা মিলছে—নমস্কার। (সরিয়া গিয়া) নাঃ বকে বকে মাথা ধরিয়ে দিলে—একটু ছায়ায় বসে মাথাটা ঠাণ্ডা করে নি।

[একটা বাড়ির ছায়ায় গিয়া বসিল]

ছোকরা। (খুশি হইয়া লিখিতে লিখিতে) মিলবে না? বলি, মেলাচ্ছে কে? সেবার যখন বিষ্ণুদাদা 'বৈকাল' কিসের সঙ্গে মিল দেবে খুঁজে পাচ্ছিল না, তখন 'নৈপাল' বলে দিয়েছিল কে? নৈপাল কাকে বলে জানেন ত? নেপালের লোক হল নৈপাল। (পথিককে না দেখিয়া) লোকটা গেল কোথায়? দুস্তোরি! [প্রস্থান]

[বাড়ির ভিতরে বালকের পাঠ— পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল। সমুদ্রের জল লবণাক্ত।]

পথিক। ওহে খোকা! একটু এদিকে শূনে যাও ত?

[বুদ্ধমূর্তি, মাথায় টাক, লম্বা দাড়ি খোকার মামা বাড়ি হইতে বাহির হইলেন]

মামা। কে হে? পড়ার সময় ডাকাডাকি করতে এয়েছ?— (পথিককে দেখিয়া)

ও আমি মনে করেছিলুম পড়ার কোন ছোকরা বুঝি। আপনার কী দরকার?

পথিক। আঙে, জল তেষ্টায় বড় কষ্ট পাচ্ছি— তা একটু জলের খবর কেউ বলতে পারলে না।

মামা। (তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলিয়া) কেউ বলতে পারলে না? আসুন আসুন!

কী খবর চান, কী জানতে চান, বলুন দেখি? সব আমায় জিজ্ঞেস করুন, আমি বলে দিচ্ছি। (ঘরের মধ্যে টানিয়া লওন—ভিতরে নানারকম যন্ত্র, নকশা, রাশি রাশি বই)

কী বলছিলেন? জলের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না?

পথিক। আঙে হ্যাঁ, সেই সকাল থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসছি—

মামা। আ হা হা! কি উৎসাহ! শূনেও সুখ হয়। এ রকম জানবার আকাঙ্ক্ষা কজনের আছে, বলুন ত? বসুন! বসুন! (কতগুলি ছবি, বই আর এক টুকরা খড়ি বাহির করিয়া) জলের কথা জানতে গেলে প্রথমে জানা দরকার, জল কাকে বলে, জলের কী গুণ।

পথিক। আঙে একটু খাবার জল যদি—

মামা। আসছে—ব্যস্ত হবেন না। একে একে সব কথা আসবে। জল হচ্ছে দুই ভাগ হাইড্রোজেন আর এক ভাগ

অক্সিজেন- [বোর্ডে খড়ি দিয়া লিখলেন]

পথিক। এই মাটি করেছে!

মামা। বুঝলেন? রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জলকে বিশ্লেষণ করলে হয়- হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ হয়ে হল জল! শুনছেন ত?

পথিক। আঙে হ্যাঁ, সব শুনছি। কিন্তু একটু খাবার জল যদি দেন, তাহলে তা মন দিয়ে শুনতে পারি।

মামা। বেশ ত! খাবার জলের কথাই নেওয়া যাক না। খাবার জল কাকে বলে?

যে জল পরিষ্কার, স্বাস্থ্যকর, যাতে দুর্গন্ধ নাই, রোগের বীজ নাই, এই দেখুন এক শিশি জল-আহা, ব্যস্ত হবেন না। দেখতে মনে হয় যেন পরিষ্কার, কিন্তু অণুবীক্ষণ দিয়ে যদি দেখেন, দেখবেন পোকা সব কিলবিল করছে। কেঁচোর মতো কৃমির মতো, সব পোকা-এমনি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখায় ঠিক এত্তো বড় বড়। এই বোতলের মধ্যে দেখুন, ও জল পুকুরের জল; আমি এইমাত্র পরীক্ষা করে দেখলুম, ওর মধ্যে রোগের বীজ গিজ্গিজ্জ করছে-প্লেগ, টাইফয়েড, ওলাউঠা, ঘেয়োজ্বর-ও জল খেয়েছেন কি মরেছেন! এই ছবি দেখুন-এইগুলো হচ্ছে কলেরার বীজ, এই নিউমোনিয়া, ম্যালেরিয়া-সব আছে। আর এই সব হচ্ছে জলের পোকা। জলের মধ্যে শ্যাওলা ময়লা যা কিছু থাকে, ওরা সেইগুলো খায়। আর জলটার কী দুর্গন্ধ দেখুন! পচা পুকুরের জল-ছেঁকে নিয়েছি, তবু গন্ধ।

পথিক। উ'হু' হু' হু'! করেন কী মশাই? ওসব জানবার কিছু দরকার নেই।

মামা। খুব দরকার আছে। এ সব জানতে হয়-অত্যন্ত দরকারি কথা!

পথিক। হোক দরকারি-আমি জানতে চাইনে, এখন আমার সময় নেই।

মামা। এই ত জানবার সময়। আর দুদিন বাদে যখন বুড়ো হয়ে মরতে বসবেন তখন জেনে লাভ কী? জলে কী কী দোষ থাকে, কী করে সে সব ধরতে হয়, কী করে তা শোধন হয়। এসব কি জানবার মতো কথা নয়? এই যে সব নদীর জল সমুদ্রে যাচ্ছে, সমুদ্রের জল সব বাষ্প হয়ে উঠছে, মেঘ হচ্ছে, বৃষ্টি পড়ছে-এসব কেন হয়, কিসে হয়, তাও ত জানা দরকার?

পথিক। দেখুন মশাই! কী করে কথাটা আপনাদের মাথায় ঢোকাব তা ত ভেবে পাইনে। বলি, বারবার করে বলছি- তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, সেটা ত কেউ কানে নিচ্ছেন না দেখি। একটা লোক তেষ্টায় জল-জল করছে তবু জল খেতে পায় না, এরকম কোথাও শুনছেন?

মামা। শুনছি বৈকি-চোখে দেখেছি। বদ্যিনাথকে কুকুরে কামড়ালে, বদ্যিনাথের হল হাইড্রোফোবিয়া- যাকে বলে জলাতঙ্ক। আর জল খেতে পারে না- যেই জল খেতে যায় অমনি গলায় খিঁচ ধরে যায়। মহা মুশকিল!-শেষটায় ওঝা ডেকে, ধুতুরো দিয়ে ওষুধ মেখে খাওয়াল, মন্তর চালিয়ে বিষ ঝাড়াল- তারপর সে জল খেয়ে বাঁচল। ওরকম হয়।

পথিক। নাঃ-এদের সঙ্গে আর পেরে ওঠা গেল না-কেনই বা মরতে এয়েছিলাম এখানে? বলি, মশাই, আপনার এখানে নোংরা জল আর দুর্গন্ধ জল ছাড়া ভালো খাঁটি জল কিছু নেই?

মামা। আছে বৈকি! এই দেখুন না বোতলভরা টাটকা খাটি 'ডিস্টিল ওয়াটার'- যাকে বলে 'পরিশ্রুত জল'।

পথিক । (ব্যস্ত হইয়া) এ জল কি খায়?

মামা । না, ও জল খায় না-ওতে ত স্বাদ নেই-একেবারে বোবা জল কিনা, এইমাত্র তৈরি করে আনল- এখনো গরম রয়েছে ।

[পথিকের হতাশ ভাব]

তারপর যা বলছিলাম শুনুন-এই যে দেখছেন গন্ধওয়ালা নোংরা জল-এর মধ্যে দেখুন এই গোলাপি জল ঢেলে দিলুম-বাস, গোলাপি রঙ উড়ে সাদা হয়ে গেল । দেখলেন ত?

পথিক । না, মশাই, কিছু দেখিনি-কিছু বুঝতে পারিনি-কিছু মানি না-কিছু বিশ্বাস করি না-

মামা । কী বললেন! আমার কথা বিশ্লেষ করেন না?

পথিক । না, করি না । আমি যা চাই, তা যতক্ষণ দেখাতে না পারবেন, ততক্ষণ কিছু শুনব না, কিছু বিশ্বাস করব না ।

মামা । বটে! কোনটা দেখতে চান একবার বলুন দেখি-আমি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি-

পথিক । তাহলে দেখান দেখি । সাদা, খাঁটি, চমৎকার, ঠান্ডা, এক গেলাশ খাবার জল নিয়ে দেখান দেখি । যাতে গন্ধপোকা নেই, কলেরার পোকা নেই, ময়লাটয়লা কিছু নেই, তা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখান দেখি । খুব বড় এক গেলাশ ভর্তি জল নিয়ে আসুন ত ।

মামা । এক্ষুণি দেখিয়ে দিচ্ছি-ওরে ট্যাঁপা, দৌড়ে আমার কুঁজো থেকে এক গেলাশ জল নিয়ে আয় ত ।

[পাশের ঘরে দুপদাপ শব্দে খোকার দৌড়]

নিয়ে আসুক, তারপর দেখিয়ে দিচ্ছি । ঐ জলে কী রকম হয়, আর এই নোংরা জলে কী রকম তফাৎ হয়, সব আমি এক্সপেরিমেন্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছি ।

[জল লইয়া ট্যাঁপার প্রবেশ]

রাখ, এইখানে রাখ ।

[জল রাখিবামাত্র পথিকের আক্রমণ-মামার হাত হইতে জল কাড়িয়া এক নিশ্বাসে চুমুক দিয়া শেষ]

পথিক । আঃ! বাঁচা গেল!

মামা । (চটিয়া) এটা কী রকম হল মশাই?

পথিক । পরীক্ষা হল- এক্সপেরিমেন্ট! এবার আপনি নোংরা জলটা একবার খেয়ে দেখান ত, কী রকম হয়?

মামা । (ভীষণ রাগিয়া) কী বললেন!

পথিক । আচ্ছা থাক, এখন নাই-বা খেলেন-পরে খাবেন । আর এই গাঁয়ের মধ্যে আপনাদের মতো আনকোরা পাগল আর যতগুলো আছে, সব কটাকে খানিকটে করে খাইয়ে দেবেন । তারপর খাটিয়ায় তুলবার দরকার হলে আমায় খবর দেবেন- আমি খুশি হয়ে ছুটে আসব-হতভাগ্য জোচ্চার কোথাকার! [দ্রুত প্রস্থান]

[পাশের গলিতে সুর করিয়া কে হাঁকিতে লাগিল-অবাক জলপান]

লেখক-পরিচিতি

সুকুমার রায় ১৮৮৯ সালে ভারতের কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম উপেন্দ্র কিশোর রায়। ‘আবোল তাবোল’, ‘খাই খাই’, ‘অবাক জলপান’, ‘হ-য-ব-র-ল’, ‘পাগলা কাকু’ তাঁর সাড়া জাগানো গ্রন্থ। ১৯২৩ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সারসংক্ষেপ

এক পথিকের পথ চলতে চলতে পিপাসা পেল। সে জলের জন্য বিভিন্ন লোকের কাছে গেল। কিন্তু কারো কাছে জল পেল না। প্রথম যার কাছে জল চাইল, তিনি জলপাই মনে করলে পথিকের সাথে এ নিয়ে মৃদু তর্কাতর্কি হয়। পরে এক বৃন্দের কাছে জল চাইলে তিনি তাকে বিভিন্ন প্রকার জলের ফর্দ শুনিয়ে দিলেন। তারপর এক ছোকরার কাছে জল চাইলে সে জলের সঙ্গে মিলিয়ে কবিতার ছন্দ বলতে শুরু করল। শেষে এক খোকর মামার কাছে জল চাইলে তিনি জলের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ শুরু করেন এবং জলের মধ্যে কত কিছুর বীজ আছে যা খালি চোখে দেখা যায় না বলে বক্তব্য দিতে শুরু করেন। পথিক বুদ্ধি করে শেষে বলল এক গ্লাস সাদা খাঁটি চমৎকার ঠান্ডা খাবার জল এনে পরীক্ষা করে দেখাতে। ঠান্ডা জল আসতেই পথিক এক নিশ্বাসে চুমুক দিয়ে গ্লাসের পানি শেষ করে কিছু মন্তব্য করে দ্রুত প্রস্থান করে।

শব্দার্থ

পথিক-পথচারী। তেষ্টা-পিপাসা। মগজ-মস্তিষ্ক। গেরস্থ-সংসারী মানুষ। জলপাই-সুপরিচিত অল্পস্বাদ ফলবিশেষ। মাছরাঙা-এক জাতীয় সুন্দর পাখি। কুয়ো-ইঁদারা, কূপ। নিন্দে-বদনাম, কুৎসা। অপদার্থ-অযোগ্য। অণুবীক্ষণ-চক্ষুর অগোচর ক্ষুদ্র পদার্থ দর্শনের যন্ত্রবিশেষ। মন্তর-মন্ত্র। জল-পানি। অবাক-আশ্চর্য।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পথিক তৃতীয়বার কার কাছে জল পান করতে চাইল?

ক. মামার কাছে	খ. ছোকরার কাছে
গ. বৃন্দের কাছে	ঘ. ঝুড়িওয়ালার কাছে
২. ঝুড়িওয়ালার কাছে পথিকের কী অন্যায় হয়েছে?

ক. ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছে, জল চাইবে কেন তাই	খ. যাত্রাপথে জল চাইল তাই
গ. ঝুড়ির মধ্যে জল নেই বলে	ঘ. বিশুদ্ধ জল নেই বলে
৩. মাছরাঙা কী?
 - i. লাল ধরনের মাছ
 - ii. এক জাতীয় সুন্দর পাখি
 - iii. মাছ খায় এমন পাখি

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. ii ও iii

খ. iii

গ. i

ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

যে জল পরিষ্কার, স্বাস্থ্যকর, যাতে দুর্গন্ধ নাই, রোগের বীজ নাই এই দেখুন এক শিশি জল-আহা, ব্যস্ত হবেন না। দেখতে মনে হয় যেন পরিষ্কার, কিন্তু অণুবীক্ষণ দিয়ে যদি দেখেন, দেখবেন পোকা সব কিলবিল করছে। কেঁচোর মতো, কৃমির মতো, সব পোকা এমনি চোখে দেখা যায় না। কিন্তু অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখায় ঠিক এতো বড় বড়। এই বোতলের মধ্যে দেখুন, ও জল পুকুরের জল; এইমাত্র পরীক্ষা করে দেখলুম, ওর মধ্যে রোগের বীজ গিজ্ গিজ্ করছে।

ক. পথিক প্রথমে কার কাছে জল খেতে চাইল ?

খ. 'এদেখি আরেক পাগল! মশাই, আমি সে রকম মিলবার কথা বলিনি।' পথিক এটি কেন বলল, লেখ।

গ. তৃষ্ণার্ত পথিকের প্রতি কীরূপ আচরণ করা দরকার বলে তুমি মনে কর- যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'অবাক জলপান' গল্পের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

রসুলের দেশে

ইবরাহীম খাঁ



এই সেই জেদ্দা যার কথা শৈশব হতে শুনে আসছি। নামের পরশে চিন্ততলে জেগে উঠেছে কত দূরদূরান্তের স্বপন। কত রোমাঞ্চকর কল্পকাহিনী। কত ব্যথা-বিদগ্ধ স্মৃতি। দেশ-দেশান্তরের কত হজযাত্রী এই জেদ্দায় জাহাজ হতে নামে, এসেছি রসুলুল্লাহ, তোমার দেশে এসেছি, এসেছি, আল্লাহ, তোমার প্রথম এবাদত-গাহের মূলুকে এসেছি বলে, কত আকুল প্রাণ কেঁদে ওঠে। উত্তেজনার আতিশয্যে কত বয়োদুর্বল যাত্রী এখানেই ঢলে পড়ে, তাঁদের মক্কা-মদিনা জিয়ারত আর হয়ে ওঠে না; তারা প্রতীক্ষমাণ আপন জনের এ-দুনিয়ার ঘরেও আর ফিরে যায় না।

সমগ্র আরবের ছবি মনের চোখে ভেসে উঠল।

সেমিটিক জাতিসমূহের লালন-ভূমি এই আরব। এই আরবদেরই এক শাখা ব্যাবিলনে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে। ফিলিস্তিন, আবিসিনিয়া এদের দিয়েই আবাদ হয়। বিভিন্ন রকম শিলালিপি হতে এখন প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত ঈসার কম-সে-কম হাজার বছর আগে আরবে এক বিরাট সভ্যতা বর্তমান ছিল। তারপর আসে পতনের যুগ।

খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আরবের বুকে বিরাজ করতে থাকে অজ্ঞতার ভয়াবহ অশ্বকার, ব্লাহীন অনাচার আর জুলুম। মুক্তির বাণী নিয়ে আসেন মরুসূর্য মুহাম্মদ (স.); নতুন আলোকের পরশে আরবের বালুকারাশি পর্যন্ত জ্বলে ভাস্বর হয়ে ওঠে। দিকে দিকে গড়ে ওঠে নতুন নতুন জাতি, নতুন নতুন রাজ্য, নতুন নতুন সভ্যতা। তারপর মুসলমানের জাতীয় জীবনে শুরু হয় অবনতির ভাটা, ইসলামের সত্য সনাতন আদর্শ ভুলে তারা চলে ভুল পথে, ডেকে আনে নিজেদের মৃত্যু। আজরাইল শিয়রে এসে বসে জান কবজ করতে তৈরি হয়।

এমন সময় আবির্ভাব ঘটে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহূহাবের। মধ্য আরবের অন্তর্গত আযাইনাতে জন্ম। বসরা, দামেস্ক ও মক্কায় অধ্যয়ন শেষ করে এই সংস্কারক ১৮৫০ সালে জন্মভূমিতে ফিরে আসেন ও ঘোষণা করেন মুসলমানেরা ইসলামের পথ হতে অনেক অনেক দূর সরে গিয়েছে— তাদের আজকের এই দুর্বলতা, এই বেইজ্জতি এরই জন্ম। অতএব মুসলমানকে আগের পথে ফিরে যেতে হবে, ধর্মে ফিরে যাওয়ার মধ্যেই তার পূর্নজীবন লাভের একমাত্র পথ। যা ইসলামের বিরোধী— তার সাথে কোনো আপোষ নেই, কারণ সে আপোষের পরিণাম জাতির অধঃপতন।

আযাইনার আমির আব্দুল ওহূহাবকে আপদ মনে করে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তিনি আশ্রয় পেলেন দারিয়া-র আমির উদারহূদয় ইবনে সউদের কাছে। মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহূহাবের আহবানে দলে দলে বেদুঈন এসে তাঁর এই সংস্কারপন্থী ধর্মমত গ্রহণ করতে লাগল এবং নতুন নতুন সংস্কারের জন্য পাগল হয়ে উঠল। আর এদিকে মুহাম্মদ ইবনে সউদ তাঁদের সমর-শিক্ষায় নিপুণ করে তুলতে লাগলেন। এই নবগঠিত সৈন্যদলের সাহায্যে মুহাম্মদ ইবনে সউদ কিছুদিনের মধ্যে সমগ্র মধ্য ও পূর্ব আরবে তাঁর শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করে ফেলেন।

এমনিভাবে আরবে সউদি শক্তি শিকড় গেড়ে বসল।

মুহাম্মদ ইবনে সউদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আব্দুল আজিজ পিতার রাজ্যের সীমাকে আরো প্রসারিত করেন। আরব তখন তুর্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। এবার তুর্ক প্রভুদের টনক নড়ল। তাঁরা তাঁকে দমন করতে লোক-লস্কর পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু তুর্ক সৈন্যরা কিছু করতে পারল না; ফিরে গেল। শোনা যায়, আবদুল আজিজ তুর্ক আক্রমণের জওয়াবে কারবালা ও মক্কা দখল করে সেখানকার মাজারগুলোকে একে একে ধূলিসাৎ করে ফেলেন ও বহু পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন লুট করে নিজের রাজধানীতে নিয়ে যান। আব্দুল আজিজের এই ব্যবহারে ব্যথিত হয়ে একজন শিয়া একদা দারিয়ার মসজিদে হঠাৎ আক্রমণ করে আবদুল আজিজকে হত্যা করেন।

এমনিভাবে কখনও জোয়ার কখনও ভাটার ভিতর দিয়ে সউদি শক্তি কালের তীর বেয়ে চলতে থাকে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। তখন শাহজাদা আবদুল আজিজ পিতা আব্দুর রহমানের সাথে কুয়েতে নির্বাসিত, ক্ষমতা তখন মুহাম্মদ ইবনে রশিদ নামক এক বিচক্ষণ আমিরের কুক্ষিগত। মাত্র কয়েকজন অনুচরসহ একদা শাহজাদা আব্দুল আজিজ পিতার তাঁবু হতে বের হয়ে ধূসর মরুর দুস্তর পথে বিলীন হয়ে গেলেন। তারপর এদিক-সেদিক ওঁত পেতে থেকে এক রাতের অশ্বকারে রাজধানী রিয়াদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, শাসনকর্তাকে পরাজিত করে হত্যা করলেন, তারপর নিজকে রিয়াদের আমির বলে ঘোষণা করে চারদিকে তাঁর শক্তিবৃদ্ধির কাজে মনে-প্রাণে লেগে গেলেন। ইনিই সউদি আরবের অধিপতি মহামান্য রাজা আবদুল আজিজ ইবনে সউদ।

আজ এ আমির, কাল ও আমিরের সঙ্গে মিলে আবদুল আজিজ আপনার শক্তি বাড়িয়ে তুলতে লাগলেন। ইতোমধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। আবদুল আজিজ বৃটিশ পক্ষ গ্রহণ করে নিজের শক্তিবৃদ্ধির নতুন নতুন পথ খুঁজতে লাগলেন। এদিকে মক্কার শরীফ হোসেন ইবনে আলী তুর্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজেকে আরব দেশগুলোর রাজা বলে ঘোষণা করে বসলেন। আবদুল আজিজ চাপা হুঙ্কারে কেবল বললেন—

বটে! আচ্ছা !! অবশেষে ১৯১৭ সালে আব্দুল আজিজ ও শরীফ হোসেনের মধ্যে রণভেরী বেজে উঠল। আব্দুল আজিজের প্রচণ্ড আক্রমণের সামনে শরীফের সৈন্য টিকতে পারল না।

১৯২৫ সালে আব্দুল আজিজ তায়েফ, মক্কা ও মদিনা দখল করে নিলেন। এমনিভাবে তিনি নেজ্‌দ ও হেজাজের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসলেন।

হজ উপলক্ষে যে আয় হয় এতকাল পর্যন্ত তাই ছিল সউদি আরবের প্রধান সম্পদ। সে আয় আজো আছে; কিন্তু ইদানীং তেলই সউদি আরবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পারস্য উপসাগরের তীরে বাহরান নামক স্থানে এই তেলের খনি—এক মার্কিন কোম্পানি এই তেলের ব্যবসা করছে; সউদি আরব অচিরেই ধনী দেশের মধ্যে গণ্য হবে। মক্কা-মদিনার মধ্যস্থ একস্থানে একটি সোনার খনিও আবিষ্কৃত হয়েছে।

আমরা যেখানেই গিয়েছি, সেখানেই সুলতান আব্দুল আজিজের প্রভাবের পরিচয় প্রত্যক্ষ করেছি। শরীফীয় আমলে ডাকাতির জুলুমের অন্ত ছিল না। কাফেলা ছেড়ে কোনো যাত্রী একটু পেছনে পড়লে সে ফিরবে, না কোনো ডাকাতির পাথরের আঘাতে পথেই পড়ে থাকবে, তার নিশ্চয়তা ছিল না। কোনো সময় কাফেলাকে কাফেলাই আক্রান্ত হয়ে পড়ত। এখন সেসব কিছুই নেই। চুরিও সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। জেদ্দা হতে মদিনা সে যুগে উটের পিঠে ১২ দিনে যেতে হত। এখন মোটর বাসে দুই দিনে যাওয়া যায়; হাওয়াই জাহাজে যেতে লাগে দেড় ঘণ্টা। পানির ব্যবস্থা আগের চেয়ে ভালো হয়েছে। আগের দিনে মাছির জ্বালায় ঠিক হয়ে বসার জো ছিল না; সেই ডরে আমরা মশারি নিয়েছিলাম। কিন্তু বাক্স হতে মশারি বের করতে হয়নি। মক্কা ও জেদ্দায় ভালো ভালো রাস্তা ও দালান-কোঠা তৈরি হচ্ছে— শুনলাম মার্কিনী পরিকল্পনা মোতাবেক। মক্কার বাজারে রেশম পশমের পোশাক-পরিচ্ছদও যে পরিমাণ দেখলাম, ঢাকার বাজারে তা নেই।

সউদি আরবের দিন দিন উন্নতি হোক। আমরা এই কামনা করি।

লেখক-পরিচিতি

ইবরাহীম খাঁ ১৮৮৪ সালে টাংগাইল জেলার ভুয়াপুর থানার শাহবাজনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. ও বি. এল. পাস করে প্রথমে ময়মনসিংহ শহরে আইন ব্যবসা শুরু করেন। পরে শিক্ষকতায় যোগদান করে দীর্ঘদিন করটিয়া সা'দত কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ছোটগল্প, নাটক, রম্য রচনা ও উপন্যাস লিখে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৭৬ সালে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

সারসংক্ষেপ

লেখক রসুলের দেশ ভ্রমণ করতে গিয়ে জেদ্দায় অবতরণ করেন। তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল আরবের ছবি। সেমিটিক জাতিসমূহের লালনভূমি আরব দেশ। এ আরব দেশের একটি শাখা ব্যাবিলনে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে। খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আরব ছিল অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। এ সময় আরবের মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যেতে আসেন শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)। দিকে দিকে গড়ে ওঠে নতুন সভ্যতা। এক পর্যায়ে আবার শুরু হয় মুসলমানদের অবনতি। এমন সময় আবির্ভাব হয় মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্‌হাবের। ইসলামের জাগরণের কাজ শুরু হয়। তাঁকে আপদ মনে করে আযাইনার আমির রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলেন। দারিয়া-র আমিরের আশ্রয় লাভ করে তিনি পুনরায় মুসলমানদের জন্য কাজ শুরু করেন। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আরবের অধিপতি আবদুল আজিজ একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসেন।

শব্দার্থ

জেদ্দা - সৌদি আরবের একটি শহর ও সামুদ্রিক বন্দর। **চিত্তভলে** - মনের মাঝে। **কঙ্ককাহিনী** - আজগুবি কাহিনী বা গল্প। **এবাদত** - প্রার্থনা, মোনাজাত। **শিলালিপি** - পাথরে খোদিত লেখা। **মরুসূর্য**- মরুভূমিতে যে সূর্য ওঠে। এখানে ইসলামের শেষ নবী হযরত মুহম্মদ (স.) কে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করে মরুসূর্য বলা হয়েছে। **অন্ধকার** - আঁধার। **শতাব্দী** - শতবর্ষ কাল। **সংস্কারক** - যে সংস্কার করে, উৎকর্ষ সাধক। **সনাতন** - অনাদিকাল হতে প্রচলিত, যা পূর্বে ছিল। **আবির্ভাব** - উপস্থিত হওয়া। **বিচক্ষণ** - বুদ্ধিমান। **ব্লগভেরী** - যুদ্ধের বাজনা। **কাফেলা** - যাত্রীদল। **অধিপতি** - রাজা, প্রভু। **মক্কা** - সৌদি আরবের একটি শহর। এখানে হযরত মুহম্মদ (স.) জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই কাবা শরীফ অবস্থিত। **মদিনা** - আরবের একটি শহর। মুসলমানদের তীর্থস্থান। **আজরাইল** - একজন ফেরেশতা। তিনি মানুষের জান কবজ করেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- খ্রিস্টীয় কত শতাব্দীতে আরবে অন্ধকার বিরাজ করত ?
ক. ৬ষ্ঠ
খ. ৭ম
গ. ৮ম
ঘ. ৯ম
- জেদ্দা হতে মদিনা যেতে হাওয়াই জাহাজে কতক্ষণ সময় লাগে ?
ক. দুই দিন
খ. দুই ঘন্টা
গ. দেড় ঘন্টা
ঘ. ১২ দিন
- আব্দুল আজিজকে হত্যা করা হয়, কারণ তিনি-
ক. বেদুঈনদের ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন
খ. মক্কার মাজারগুলোকে ভেঙে ফেলেছিলেন
গ. শিয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন
ঘ. রিয়াদের শাসনকর্তার সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন
- আঁধার শব্দের অর্থ কোনটি ?
ক. পাত্র
খ. মাছের খাদ্য
গ. ধার করা
ঘ. অন্ধকার
- মুহাম্মদ (স:) কে মরুসূর্য বলা হয়েছে, কারণ তিনি-
ক. ইসলামের প্রবর্তক
খ. নতুন সভ্যতার জনক
গ. বেদুঈনদের শত্রু
- সৌদি আরবে সুলতান আব্দুল আজিজের অবদান কোনটি ?
ক. সাধারণ নাগরিকদের কর মওকুফ করা
খ. যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো
গ. নাগরিকদের জন্য মশারির ব্যবস্থা করা
ঘ. রাস্তার পাশ পাথর দিয়ে সাজানো

সৃজনশীল প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

“খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আরবের বুকে বিরাজ করতে থাকে অজ্ঞতার ভয়াবহ অশ্বকার, ব্লাহীন অনাচার আর জুলুম। এমন সময় মুক্তির বাণী নিয়ে আসেন মরুসূর্য মুহাম্মদ (স.)।”

- ক. কোন সময় আরবের বুকে অশ্বকার বিরাজ করত ?
- খ. ভয়াবহ অশ্বকার বলতে এখানে কী বুঝানো হয়েছে?
- গ. মানব মুক্তির জন্য রসুল (স.) যে পথ অনুসরণ করেছিলেন তার বর্ণনা দাও।
- ঘ. রসুল (স.) কে লেখক কেন ‘মরুসূর্য’ উপাধিতে আখ্যায়িত করেছেন তা বিশ্লেষণ কর।

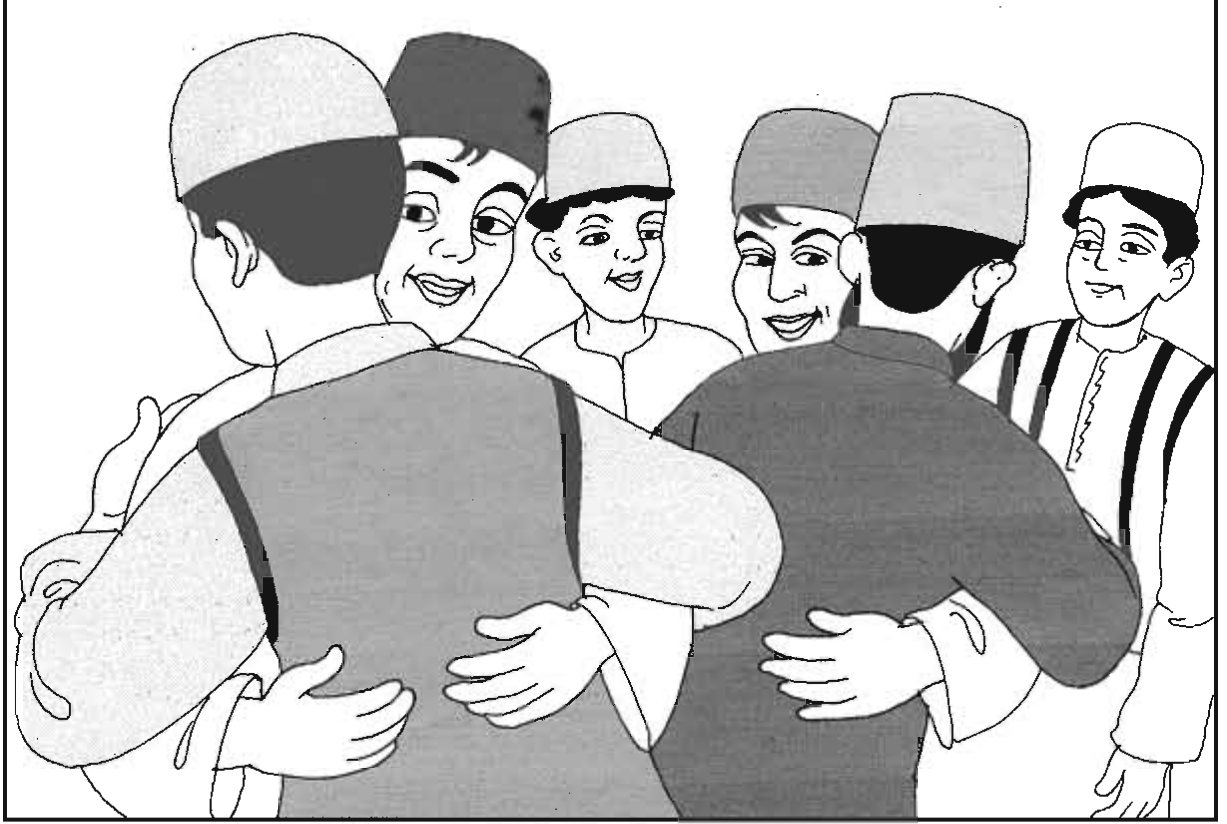
নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মহানবীর মৃত্যুর পর আরব দেশ পুনরায় অশ্বকারে নিমজ্জিত হয়। ঠিক তখনই আবির্ভাব ঘটে একজন ধর্ম সংস্কারকের। তাঁর মতে, ইসলাম ধর্মের পুনর্জাগরণের জন্য আরবদের প্রকৃত অর্থে ধর্মে ফিরে আসতে হবে। ১৮৫০ সালে এটি বাস্তবায়নের জন্য তিনি তাঁর জন্মভূমিতে ফিরে আসেন।”

- ক. কখন আরব পুনরায় অশ্বকারে আচ্ছন্ন হয় ?
- খ. ইসলাম ধর্মের পুনর্জাগরণ বলতে কী বোঝায়?
- গ. ধর্ম-সংস্কারকের মতে মহানবীর মৃত্যুর পর আরবদের করণীয় কী ছিল।
- ঘ. মানুষকে ধর্মে ফিরিয়ে আনতে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

ওকিং মসজিদে ঈদের জামায়াত

মুহম্মদ আবদুল হাই



লন্ডন পৌছার দু'দিন পরেই আমরা বকরা ঈদের নামায পড়তে গেলাম লন্ডন থেকে মাইল তিরিশেক দূরে ওকিং মসজিদে। লন্ডনে মুসলমানদের আরও কয়েকটি মসজিদ আছে। কিন্তু ওকিং সবচেয়ে বিখ্যাত মসজিদ।

বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা হবে। মসজিদ কমিটির সৌজন্যে অন্তত একটি বেলায় জন্য সিদ্ধ খাবারের দেশে রসনা পরিতৃপ্তিকর মুসলমানি খানা খাওয়া যাবে। আরও দেখা যাবে দুনিয়ার নানা জাতির মুসলমানকে—এক টিলে এতগুলো পাখি মারা যাবে দেখে লন্ডন প্রবাসীরা তো বটেই, এমনকি ইংল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের অবস্থানকারী মুসলমানরাও ঈদের দিনটিতে ওকিং-এ নামায পড়তে আসে।

মুসলমানদের ঈদের নামাযের ধর্মানুভূতি ও ধর্মানুষ্ঠান ছাড়াও একটা বড় দিক আছে। সেটা হল তার সামাজিক দিক। এর মাধুর্য ও সৌন্দর্য কম নয়। এক আল্লাহ ও রসুলকে কেন্দ্র করে এক ধর্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ মানুষকে কী করে একত্র করেছে; ছোট্ট এ ওকিং মসজিদের প্রাঙ্গণে তার অপূর্ণ রূপ দেখে সত্যিই মন চমৎকৃত হয়। ঈদের দিনে ওকিং-এ এসে নানা জাতের মুসলমানদের মিলনে জামায়াত ও মিল্লাতের এ দিকটা এত করে চোখে পড়ে যে, অমুসলিমও তাতে আকৃষ্ট না হয়ে পারে না।

এখানে এসে আর একটা নতুন জিনিস চোখে পড়ল। ইসলাম ধর্ম যে জগতের নানা দেশে ছড়িয়ে আছে তার চাক্ষুষ পরিচয় পেলাম। মিসর, আরব, সিরিয়া, ইরাক, পারস্য, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, চীন এবং আফ্রিকার বহু মুসলমান এসেছে। আর ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের আমরা তো অনেকেই ছিলাম। এক এক দেশের লোক দেখতে এক এক রকম। ভিন্ন ভিন্ন রকমের চেহারা ও শরীর অথচ ঈদের নামায পড়তে এসে সব দেশের মুসলমানই ধর্ম বাঁধনে ভাই ভাই হয়ে গেছে। নামায শেষে চেনা-অচেনা নানা দেশের মুসলমানের কোলাকুলি দেখে কী যে আনন্দ পাওয়া গেল, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। এ কোলাকুলি একদিকে যেমন মুসলমানে মুসলমানে, অন্যদিকে তেমনি জাতিতে জাতিতে।

নামায হল আরবিতে। কিন্তু ইমাম সাহেব খোতবা পড়লেন সকলের বোধগম্য ভাষা ইংরেজিতে। যাদের কাছে খোতবা পড়া হয়, তাদের ইসলামের সারকথা বোঝানোই খোতবার অর্থ। ওখানে নানা দেশের নানা লোক এসেছিল। এরা মোটামুটি সকলেই ইংরেজি বোঝে। খোতবায় ইমাম সাহেব বুঝাচ্ছিলেন। সকলের শোনার ধরন দেখে মনে হল সকলেই তা বুঝছে। ইংল্যান্ডের মতো আমাদের দেশের এ বিষয়ে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশে যদি মাতৃভাষায় খোতবাটা পড়া হত তাহলে অনেক মজ্জল হত আমাদের সাধারণ মুসলমানদের।

নানা দেশের অমুসলমানরাও ওকিং-এ এসেছে নানা বেশভূষায়। কেউ দেখতে, আর কেউ বন্ধুদের নেমন্তন্ন খেতে। ইংরেজরা সিঁধ ছাড়া তো কিছু খেতে জানে না। এ সুযোগে তাই এখানকার প্রবাসী মুসলমানেরা তাদের বন্ধু-বান্ধবদের মুসলমানি খাবার খাইয়ে বন্ধুত্ব গাঢ় করে।

নামাযের পরে নামাযের তাঁবুতেই মসজিদ কমিটির তরফ থেকে কয়েকবারে হাজার দেড়েক লোক খাওয়ানো হল। সবাই তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম পোলাও আর কালিয়া। ওকিং-এর এ খাওয়ার মধ্যে আর একটু বৈশিষ্ট্য আছে। মুসলমানদের হাতে হালাল করা টাটকা গোশত ঈদের নামায উপলক্ষে একটি দিনের জন্য এখানেই পাওয়া যায়। ইংল্যান্ডের গোশতের মোটা ভাগ আসে আর্জেন্টিনা থেকে। বিদেশ থেকে যে গোশত ইংল্যান্ডে আসে জবাই হবার পর থেকে মানুষের পেটে গিয়ে পৌঁছতে তার তিন চারটে মাস সময় লেগে যায়।

ঠান্ডা দেশ বলে গোশত নষ্ট হয় না। এর ওপরে আছে রেফ্রিজারেটর আর বরফ। দোকানে দিনের পর দিন এ গোশত ঝুলতে দেখা যায়। সুতরাং ঈদের দিন সাধারণ মুসলমান টাটকা গোশত খাবার আনন্দ মেটায়। আর ধর্মভীরুরা বহুদিন রোজা থাকার পর হালাল গোশত খাবার সুযোগ পেয়ে আল্লাহর কাছে এখানে শোকর গোজার করে।

পৃথিবীর জনসমুদ্রের সঙ্গে মিশবার ও বিচিত্র শোভা দেখবার সুযোগ পাই লন্ডনে। আজকের দিনে আরও শোভা দেখলাম মুসলমান জগতের। লন্ডন দুনিয়ার কসমোপলিটান শহরগুলোর অন্যতম। ইংরেজ রাজত্বের সমৃদ্ধির সঙ্গে লন্ডন শহর দুনিয়ার নানা দেশেরই স্নায়ু কেন্দ্র এবং তীর্থক্ষেত্র হয়ে রয়েছে। এখানে নানা দেশ থেকে নানা লোক আসে। নানা কিছু শিখতে ও দেখতে। তাই ইংল্যান্ড ভরে আছে নানান দেশের মুসলমানেও।

ইসলাম বিশেষ কোনো একটি জাতির ধর্ম নয়। নানা জাতি, নানা দেশ এ ধর্মের বাঁধনে কী অশুভভাবে বাঁধা পড়েছে— এখানকার ঈদের দিনে ওকিং তার অপূর্ব দৃষ্টান্ত তুলে ধরে। ওকিং মসজিদের সামনে বিরাট শামিয়ানা খাটানো হয়। তার চারধার দিয়ে এক একটা মুসলিম দেশের পতাকা টাঙানো হয়। পতাকাগুলোর দিকে একবার চোখ বুলালেই সে দেশের জাতীয় সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ,

পাকিস্তান, আফগানিস্তান, সউদি আরব, ইয়েমেন, লেবানন, ইরাক, সিরিয়া, মিসর, জর্দান, তিউনিসিয়া, তুরস্ক, মরক্কো প্রভৃতি দেশের এক এক নিশান আকাশে উড়ছে। আর মাটিতে এক এক দেশের অপূর্ব পোশাক পরিচ্ছদ ভূষিত এক এক রকম চেহারার নর-নারী। তার মধ্যে আফ্রিকার নিগ্রো মুসলমানের পোশাক-পরিচ্ছদই অদ্ভুত ধরনের। ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানেরা, চীন ও জাপানের পীত জাতের মধ্যে যেমন রঙের সুসমা রক্ষা করেছে, তেমনি মরক্কোর মুসলমানেরা ইউরোপের শ্বেত জাতির সবচেয়ে নিকটবর্তী বলে রঙের দিক থেকে ভারসাম্য রক্ষা করেছে। মাঝখানে আমরা বাঙালিরা না কালো না ফরসা। কিন্তু আফ্রিকার নিগ্রোর জমকালো। ওকিং-এ দেখলাম নানান জাতির ক্লাস, পোশাক আর নানা জাতির নানা রং। এত বৈষম্য অপূর্ব সুন্দর বাঁধনে বাঁধা পড়েছে। সে বাঁধন হচ্ছে এক আল্লাহ এবং তাঁর রসুলে বিশ্বাস।

লেখক-পরিচিতি

মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার মরিচা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত এ ধ্বনিবিজ্ঞানী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। দীর্ঘদিন উক্ত বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। ১৯৬৯ সালের ৩রা জুন এক ট্রেন দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। লন্ডনে অধ্যয়নকালে সেখানকার জীবন ও প্রকৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতার আলোকে লেখা তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনী 'বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন'। তাছাড়া তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো; 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্ব', 'রাজনীতি ও তোষামোদের ভাষা'।

সারসংক্ষেপ

মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৫২ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। সে সময় তাঁকে সাড়ে সাতশ দিন বিলেতে কাটাতে হয়েছিল। প্রবাসজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর বিখ্যাত 'বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন' গ্রন্থে। উক্ত গ্রন্থের সামান্য একটু অংশ হচ্ছে 'ওকিং মসজিদে ঈদের জামায়াত'। লন্ডনের মতো কসমোপলিটান শহরেও কী সুন্দর ও আনন্দদায়ক ঈদের জামায়াত অনুষ্ঠিত হয়, তারই একটি সুন্দর বর্ণনা এখানে আছে। দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও অপূর্ব এক সুন্দর বাঁধনে বাঁধা পড়ে আছে বিশ্বের সকল মুসলমান; আর সেটা হচ্ছে ধর্মানুভূতির বাঁধন।

শব্দার্থ ও টীকা

ধর্মানুভূতি - ধর্মের জন্য অনুভূতি। **প্রাক্কাণ** - অজ্ঞান, উঠান। **চমৎকৃত** - বিস্মিত। **সৌজন্য** - ভদ্রতা। **চাক্ষুষ** - নিজের চোখে দেখা, প্রত্যক্ষ। **হালাল** - মুসলমান ধর্মমতে বৈধ বা পবিত্র। **খোতবা** (খোত্বা) - ইসলামের বিজয় ঘোষণা। **কসমোপলিটান** - বহুজাতিক, বহু জাতের সমাবেশ। **দৃষ্টান্ত** - উদাহরণ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

ইংল্যান্ডে গোশত কম নষ্ট হওয়ার কারণ-

- i. ঠান্ডা বেশি বলে
- ii. প্রত্যেকের ঘরে রেফ্রিজারেটর আছে
- iii. সংরক্ষণ ব্যবস্থা উন্নত

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|--------|------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সুমন ও সমিয়া লন্ডনে তার পিতামাতার সাথে বসবাস করে। ঈদের দিন নামায পড়তে গেল ওকিং মসজিদে। নানা দেশের নানান মানুষ চোখ ঝাঁধানো সব পোশাক পরে ঈদের নামায পড়তে এসেছে এখানে। একই ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে ওকিং মসজিদ প্রাঙ্গণ।

- ক. ওকিং মসজিদ কোথায় অবস্থিত ?
- খ. ঈদের দিনে ওকিং মসজিদের কোন দিকটা অমুসলিমদেরও আকর্ষণ করে।
- গ. তুমি এবার ঈদে যেখানে নামায পড়েছো সেখানকার বর্ণনা দাও।
- ঘ. ‘ঈদ মানুষের মিলন মেলা’ – বিশ্লেষণ কর।

২. ওকিং মসজিদে নামায হল আরবিতে কিন্তু ইমাম সাহেব খোতবা পড়লেন ইংরেজিতে। ওকিং এ যারা নামায পড়তে এসেছিলেন তারা মোটামুটি সকলেই ইংরেজি বোঝেন। তাই তাদের প্রত্যেকেই খোতবার অর্থ বুঝেছিল। সুমন যে মসজিদে ঈদের নামায পড়েছে সেখানে খোতবা আরবিতে হওয়ায় সুমন খোতবার কোন অর্থই বোঝেনি।

- ক. খোতবা কী ?
- খ. সুমন খোতবার অর্থ বোঝেনি কেন ?
- গ. ওকিং মসজিদে ঈদের খোতবা ইংরেজিতে পড়ার কারণ কী ?
- ঘ. মাতৃভাষায় খোতবা পড়ার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।